দেবযান : এই পথে একা একা হাঁটতেন বিভূতিভূষণ

অরুণিমা বিশ্বাস

না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা না ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

— ভগবদ্‌গীতা

১৩৫৭-র অগ্রহায়ণে প্রকাশিত *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায়, বিভূতিভূষণ *দেবযান* উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৩২ সালে। তারপর — 'কিছুটা লিখে বন্ধ করি। মনে হল, ভূতুড়ে গল্প বলে এ কেউ পড়বে না। তারপর আবার আরম্ভ করি ১৯৪০ সালে।' আর এর প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৪৪ সালের ৩ অক্টোবর। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৪৬ সালের ২১ জুন। এটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, একেবারে গ্রন্থাকারেই এটি 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

অন্তরের সুনিবিড় উপলব্ধি আর জীবনের প্রতি দৃঢ় আস্তিক্যবোধ — তাঁর এই উপন্যাসের ভিত্তি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনের অন্তিমে যে অপার অবিশ্বাস্য-আনন্দঘন মৃত্যুর সূচনা — সেই চিরন্তন সত্যকেই লেখক যেন বা তাঁর জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। আর তাই একথা বলা তাঁর পক্ষেই সহজতর হয়ে পড়ে :

> এ আমার অভিজ্ঞতার কথা। ... 'দেবযান' পড়ে প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই, — সত্যি বলছি সন্দেহ করবার কিছু নেই। ... পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান। ... বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে। এগুলির আকর্ষণ অতি তীব্র — পৃথিবীর জীবনের পরে যখন এইসব লোকে গতি হয়, তখন পৃথিবীর আনন্দ এদের আনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেই আসক্তি বা কামনাই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে।

আর এর প্রমাণ দেন স্বয়ং লেখকই :

> আবার যদি জন্ম হয় তবে যেন ওইরকম দীনহীনের পর্ণকুটিরে, অভাব-অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্য নদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।

এ যেন সেই *দেবযান* উপন্যাসেই পুষ্পর তৈরি বুড়ো শিবতলা ঘাট; যেখানে অতীত এক আগামীর অপেক্ষায় 'ঘর' সাজিয়ে বসে আছে।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে *দেবযান*-ই হয়তো-বা সেই একক উপন্যাস — যেখানে উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়েই গল্পের নায়ক যতীনের মৃত্যু হয়। আর তার শৈশবের সঙ্গী, পুষ্প তাকে নিয়ে আসে — ছোটোখাটো এক সুন্দর বাড়িতে — যা সে কল্পনায় সৃষ্টি করে রেখেছে তার

যতীনদার জন্য। লেখক আমাদের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দেন সেই জায়গার; পুষ্প বলে, মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে — 'এ আমাদের স্বর্গ — তোমার আর আমার স্বর্গ।' অতঃপর এ উপন্যাস এসে উপস্থিত হয় সেই 'স্বর্গে' — যেখানে :

বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

— ভগবদ্‌গীতা

এ তো গেল পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার একাত্মীকরণের প্রয়াসকথা। তবে *দেবযান* উপন্যাসের বিশাল বিশ্বেও ঈশ্বর যেন বালক স্বভাব — উদাস; বিশ্ববনে বাঁশি বাজিয়ে আপন মনেই একা থাকেন; আবার যদি কেউ ভালোবেসে ডাক পাঠায় তাঁকে; সঙ্গী পেয়ে খুশি হয়ে ভালোবাসার ঘর বাঁধেন তিনি। না, রাধা নয়; 'কে রাধা? যে নারীই ভালবাসে তাঁকে, সে-ই রাধা।' সেই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন। অপরদিকে আরও একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ — পৃথিবীতে যাঁর শেষ জন্ম গ্রীসে। তাঁর মতে — ঈশ্বর অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তি; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। অপূর্ব তাঁর ধৈর্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা — তবে নিত্যমূর্তির রূপে তাঁর সন্ধানমেলা ভার। সবই যেন বা তাঁরই মূর্তি — এই গাছপালা — এই বনভূমি — এই অনন্ত আকাশ ... আসলে প্রেমের সঙ্গে প্রেমিকের যে বাঁধন; চন্দনের সঙ্গে সুবাসের যে সখ্য; বৃষ্টি আর বিদ্যুতের যে আলিঙ্গন — তেমনি সৃষ্টি-বিশ্বের সঙ্গে স্রষ্টা-ঈশ্বরের সেই অন্তরঙ্গতা। আর এখানেই বোধহয় 'আত্মর' সন্ধান — 'আত্মানং বিদ্ধি' — আত্মজ্ঞানের আলোকেই মুক্ত হবে সৃষ্টি — স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবে সৃষ্টির আনন্দধারা — সত্য হবে ত্রিভুবনেশ্বরের প্রেম।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই প্রেমেরই আকাঙ্ক্ষায় ও তারই সন্ধানে রত থাকেন লেখক। আজ ছ-বছর হল যতীনের স্ত্রী আশালতা সন্তানসহ চলে গেছে বাপেরবাড়ি। এবার 'বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে' আর আশ্বিনের মাঝামাঝি ক্রমে সেরে উঠলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার জ্বরে পড়ল সে এবং একদিন সকালে পাড়াগাঁয়ের অনেকে দোর ভেঙে দেখল —

> যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

এরপর তার 'স্বর্গে' (স্বঃ — উপর, ঊর্ধ্ব; গ — গমন করা) গমন, পুষ্পের সাহায্যে। সেই পুষ্প, ব ... হু বছর পূর্বে বসন্তের প্রকোপে মৃত্যু হয়েছে যার। আর যতীনকে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তাঁর 'কল্পনা' দিয়ে তৈরি 'কেওটার গঙ্গার ঘাটের ধারে।'

এরপর শুরু হয় তাদের 'যুগলচলন'। তার যতীনদাকে 'সঙ্গী' করে পুষ্প ভুবর্লোকের বহু স্তর থেকে স্তরান্তরের পথে বিচরণ করে বেড়ায়। তবে যতীন পুষ্পের আমৃত্যু কিংবা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেরও একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত-জন হলেও —

> সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমনকি কিছু কিছু ভয়ও করে। ... এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে

খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা ...

... এ উপন্যাস আসলে প্রেমেরই উপন্যাস। আদতে এ এক ভালোবাসার উপাখ্যান। সে যতীনের প্রতি পুষ্পর ভালোবাসাই হোক আর আশার প্রতি যতীনের কিংবা আস্তিক্যের প্রতি উচ্চ-শ্রেণির দেব-দেবীর অথবা পূর্ণতার প্রতি স্বয়ং লেখকের।

ভুবর্লোকের বহু স্থান অতিক্রম করতে করতে পুষ্প ও যতীনের সঙ্গে দেখা হয় বহু মনীষী; বহু মহাপুরুষ; বহু দেব-দেবীর। *রামায়ণ* রচয়িতা বাল্মীকি ও তাঁর মানস-দুহিতা সীতা (করুণা-দেবী); রাশিয়ান ডাক্তার আমেন্ডো; প্রণয়দেবী, গ্রহদেব বৈশ্রবণ, বৈষ্ণব-আচার্য রঘুনাথদাস; কবি ক্ষেমদাস প্রমুখ আত্মার সঙ্গে পরিচিত হয় তারা। ঋদ্ধ হয় প্রেমে; সমৃদ্ধ হয় জ্ঞানে-চেতনায়-ভক্তিতে-ঔদার্যে।

তবু এতকিছুর মধ্যেও 'অপরিবর্তনীয়' সেই যতীন, যে ভাবে — 'এ বাঁধন বিধির সৃজন; মানব কি তার খুলতে পারে?' তাই পুনর্জন্মের টানে সে যখন পুনরায় এক দরিদ্র-জননীর ঘরে ভূমিষ্ঠ হয় মাত্র কিছুদিনের জন্য; ভুবর্লোকে ফিরে গিয়ে সে যেন আবার অনুভব করে :

> কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য মায়ার বাঁধন, মনে হচ্ছে স্বর্গ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে — এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে সুখদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি, এই গরীব মায়ের তারই জন্যে এ আকুল-বুকফাটা বিলাপ — এ সব জীবন-স্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অঙ্ক-অভিনয়ের দৃশ্যপট! ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

তাই আবারও জন্ম নেয় সে, জন্ম নেয় এই 'মায়া আর স্বপ্নের' পৃথিবীতে। আশাও নিজের অন্ধকার জীবন থেকে চিরতরে নিষ্কৃতির খোঁজে 'আত্মহত্যা' করে এখন জন্ম নিয়েছে এক 'মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ীতে।'

আর অন্যদিকে আছে পুষ্প; আছে তার :

> স্বরচিত বুড়োশিবতলার ঘাটে সম্পূর্ণ একা। করুণাদেবীও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত উচ্চস্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ — তার মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক — লোকাতীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক, কোথাও পোষাবে না তার। কত সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

মাঝে মাঝে তার যতীনদাকে কোলা-বলরামপুর গ্রামে গিয়ে দেখে আসে পুষ্প। 'খোকার' শিয়রে বসে সে পরম মমতায় বলে ওঠে :

> খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও — দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো?

প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন লেখক। পড়ে পাওয়া 'চোদ্দো আনার' শেষে যখন পুষ্প

দেখতে পায় সেই পরম 'দেবতাকে' যিনি জীবন-উল্লাসের স্রোতে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেছেন মহা-ঈশ্বরের ইঙ্গিতে।

> উনিই বিশ্বের আদি কারণ — সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল — সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। ... উনি ছাড়া আর কি আছে?

দেবযান উপন্যাসের আলোচনায় এই তথ্য বা তত্ত্বানুসন্ধান চিরপ্রচলিত; হয়তো-বা কিছু অংশে গতানুগতিক। আধুনিক ধারার সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্যতত্ত্ব এখন আমাদের জীবনযাপনের বা জীবনধারণের পথকে বহুবিধ দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে বিচার করতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বাস্তবতার বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিকল্পতর এক সত্যের অনুসন্ধান করতে।

আমরা আজ — এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে জেনে গেছি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নান্দনিক স্টাইল বা সংরূপগত বৈশিষ্ট্যকে — যেখানে জাদু বা ঐন্দ্রজালিক উপাদানগুলি প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে প্রকাশ করে জীবনের গভীরতম রহস্যালোককে — তাত্ত্বিকভাষায় এরই নাম — Magic Realism। যদিও পাশ্চাত্য সাহিত্যই এর জন্মদাতা বলে অনেকে মনে করেন, তবে তার অনেক আগেই প্রাচ্যে এই মতবাদের আবির্ভাব। *রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য-ইউসুফ জোলেখা*-সহ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই শৈলীটির বিকাশ ঘটে গেছে প্রায় সর্বত্রই।

বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট তত্ত্বের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে আমাদের। আসলে এই আঙ্গিকটি মূলত বাস্তব ও অবাস্তবের সম্মিলিত প্রয়াসেই গড়ে ওঠে; চকিত সময় বদলের নৈপুণ্যে; আকস্মিকতার সমাবেশেই সৃষ্টি হয় এই বিকল্প-বাস্তব। চেতন, অবচেতন ও অর্ধচেতন — ত্রিস্তরীয় এই সম্মিলনে এর মানসপর্যায় গঠিত হয়। বাস্তবের গভীরতম বা প্রকৃত অবস্থার চিত্রণ এবং তার সঠিক প্রতিফলন ঘটানোই এই শৈলীর অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। অসাধারণ ক্ষমতা বা অদ্ভুত আবহ; কিংবা অলৌকিক ঘটনাকে মহাকাব্যিক মাত্রাদান করাও এই সংরূপের এক অসামান্য প্রয়াসও বটে।

যেহেতু এই ম্যাজিক রিয়্যালিজম-এর সমার্থক হিসেবে আমরা Alternative World বা বিকল্প-বাস্তবতা নামক শব্দটিকে বেছে নিয়েছি — তাই উপন্যাস-আলোচনার আগে জেনে নেওয়া দরকার যে এই বিকল্প বাস্তবতার ক্ষেত্রে বর্ণনীয় বিষয় কোনগুলি!

সাধারণত ক. Abnormal Occurence (অবাস্তব আবহ); খ. Sense of Mystery (রহস্যানুভূতি) গ. Marvellous Reality (চমৎকৃত সত্য); ঘ. Uncanny Reality (which can not be); ঙ. Authorial Reticence (লেখকের নৈঃশব্দ্য); চ. Political Criticism (রাজনৈতিক সমালোচনা) ছ. Metafiction — প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংমিশ্রণেই কাহিনির কাঠামোটি এই বিকল্প বাস্তবতা বা Magic Realism-এর রূপ ধারণ করে। এবং এক্ষেত্রে উপরিউক্ত কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যাতেও অগ্রসর হতে পারি আমরা। যেমন :

ক. কাল্পনিক বাস্তবতা বা বিকল্প বাস্তবতার মধ্যে এক বা একাধিক জগতের কথা এবং ভিন্ন

ভিন্ন সময়ের কথা বর্ণিত হতে পারে। এর মধ্যে একটি বাস্তবের ও অপর জগৎটি স্বপ্নেরও হতে পারে।

খ. বিকল্প বাস্তবতার কথা বর্ণনাকালে প্রচলিত বাস্তবতার বা প্রথাবদ্ধ সত্য-অসত্যের সংকীর্ণ সীমারেখা ভেঙে যেতে পারে অনায়াসেই।

গ. কাল্পনিক বাস্তবতার মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে বা ঘটেছে — সেগুলি কেন ঘটছে, কোথা থেকে ঘটছে এবং সেগুলি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি না — এ প্রসঙ্গে লেখক ব্যাখ্যাতীতভাবে নীরব-নৈঃশব্দ্য পালন করবেন; পাঠককেও প্রশ্নহীনভাবে সেই বিকল্প বাস্তবতার জগতকে মেনে নিতে হবে।

ঘ. দেশকাল সম্পর্কিত বা রাজনৈতিক ঘটনা সংক্রান্ত সমালোচনা এবং সে প্রসঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গ বা সত্যাচরণকে লেখক কখনো-কখনো রূপকের সাহায্যে তার লেখনী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

তবে একথাও বলা আবশ্যিক যে, নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য বা তত্ত্বানুগত কিছু বিষয় বা সংজ্ঞা দ্বারা কোনো শৈলীই নান্দনিক হয়ে উঠতে পারে না, প্রয়োজন হয় লেখকের মুনশিয়ানা ও কাহিনি-নিহিত এক স্থায়ী সত্যানুসন্ধান। তবু বর্ণনার বিষয়কে অস্বীকার করেও এ বক্তব্য শেষ করা সম্ভবপর নয় বলেই কিছু আলোচনার এখানে বিস্তার ঘটানো হল।

দেবযান উপন্যাসের মধ্যে থেকেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে বিকল্প বাস্তবতার এক অন্যতর কথকতাকে।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই যতীনের মৃত্যু হয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদেই দেখা হয় তার সেই পুষ্পর সঙ্গে — 'একসময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল? ... সেই পুষ্প।' যতীনের চেতনায় ও মননে স্থির হয়ে আসে অকল্পনীয় বা কল্পনাতীত জগতের স্পষ্ট এক চিত্ররেখা:

> ... একেই বলে মৃত্যু? ... এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? ... দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে — কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য দেখা যায় না — অথচ অন্ধকারও নেই — ভারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরি।
>
> (Abnormal Occurence : অবাস্তব আবহ)

আবার কখনো বা সে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে রহস্য-অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। উচ্চশ্রেণির দেবতাদের বিদ্যুতের ভাষা তাকে বিহ্বল করে রাখে —

> ঊর্ধ্বতন লোকে — নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যেসব উচ্চস্তর, সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাদের ক্রিয়াকল্প — তাঁদের সে বিরাট সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না — তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আগুনের বা বিদ্যুতের ভাষায় চলে তাঁদের কথাবার্তা।

অন্যদিকে সেই উচ্চস্তরের দেবতারাও মুগ্ধ হন — পুষ্প আর যতীনের কথোপকথনে :

> দুই নবদৃষ্ট আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ দ্যাখো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও এর কি রহস্যময় মূর্তি।
>
> (Sense of Mystery : রহস্যানুভূতি)

আর আছে সেই বালকস্বভাবের ঈশ্বর — যে তার ভালোবাসার ভক্তটির কাছে অপত্য স্নেহ আর বাৎসল্যের এক অপরূপ চিত্রনির্মাণ করেন। 'মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠল — ওখানে বসে বক্‌বক্ না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু? তেষ্টায় মলুম' — এ কণ্ঠস্বর স্বয়ং বালগোপালের। নীল পাথরের মূর্তি নয় — সে জীবন্তও বটে। 'যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেচে' — তার কাছে এ হয়তো নিছকই 'পুতুলখেলা'। তবু এ কল্পনা — এ জগৎ — এ সত্য — আমাদের চমৎকৃৎই করে আপাদমস্তক।

(Marvellous Reality : চমৎকৃত সত্য)

হ্যাঁ একথা যথার্থই যে, লেখকের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি আর আস্তিক্যবোধের ত্রয়ী সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি। আর এ তাঁর মননের গভীরে এতই নিবিড়ভাবে সঞ্জাত যে, 'লেখকই ঈশ্বর' — এই নিরিখে তাঁকে বিচারকের বা বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় না উপন্যাসপটে। বরং তাঁর মানসজাত চেতনার সন্ধান মেলে তাঁর দিনলিপি পাতায় — *স্মৃতির রেখা*-য় যেন শুনতে পাই সেই অর্ধচেনা কণ্ঠস্বর —

> মাথার উপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ উদাস রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু, নীহারকণা, নীহারিকা, সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলোকবর্ষ পারের দেশ ... প্রচণ্ড জাগতিক তেজ ... এই জন্মমৃত্যু, পায়ের নিচের লক্ষকোটি প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলা-উৎসব!

লেখক-নৈঃশব্দ্য উন্মুক্ত হয় স্মৃতিচর্যায় যা এই উপন্যাসেরও যেন বা অঙ্গাংশ হয়ে ওঠে সহজেই। (Authorial Reticence : লেখকের নৈঃশব্দ্য)

আরিস্ততল তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে আবিষ্কার করেছিলেন এক অপূর্ব সঙ্গমক্ষেত্র। যেখানে বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সামনে রেখে তিনি নির্মাণ করেন Probable Impossibilities বা সম্ভাব্য এক অসম্ভবকে। আর অন্যদিকে ছিল Improbable Possibilities — অর্থাৎ অসম্ভাব্য সম্ভব। প্রথম বিষয়টি সাহিত্যের একটি প্রাচীন বর্ণনীয় বিষয় হলেও দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি তাঁর ধারণায় একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। তবে বিকল্প বাস্তবতার হাত ধরে আজকের সাহিত্যে এর দেখা মেলে; এবং পূর্বেও বলা হয়েছে, এর সূচনা সেই সুদূর প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কাল থেকেই অন্তত বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে।

দেবযান এই ধরনের এক বিকল্প বাস্তবতারই সন্ধান করে চলা উপন্যাস — যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এক মহাজাগতিক চিত্রপট (cosmic imagination)। আরিস্ততলের 'অসম্ভাব্য

সম্ভবের' বিশ্বকে সে সহজেই তার অবয়বে ধারণ করে নেয় — শুধু তাই নয়, তাকে লালন করে চলে এক কাল্পনিক বাস্তবতার সম্ভাব্য মোড়কে। মৃত্যুপরবর্তী যে অলৌকিক জীবন — বৃহৎ বিশ্বের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যা দু-দণ্ড শান্তি দেয় স্ব-জনহীন 'অস্তিত্ব'-কে; সেই সময়েরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুসঙ্গকে সামনে রেখে তাঁর এই 'স্বপ্ন-স্বর্গের' উপন্যাসকে সাজিয়ে তুলেছেন লেখক।

উপন্যাসটির স্বরূপ-লক্ষণ বিচার করলে, যৎসামান্য আলোচনার দ্বারাই প্রমাণ করা যায় — কেন সর্বার্থেই এটি জাদুবাস্তবতার সার্থকতম প্রয়াস। মনে করা যাক, মহাভারতের সেই প্রাচীন আখ্যানটির কথা — যেখানে সমুদ্রমন্থনের দ্বারা উত্থিত অমৃতপানের আকাঙ্ক্ষায় সুর-অসুরের যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমরা। কেবল অমৃত সেবনের আকাঙ্ক্ষা অথবা 'শুভের জয়; অশুভের পরাজয়কে' চিহ্নিত করতেই এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করেননি মহাকবি। আসলে অমরত্বকে সাক্ষী রেখে অনন্ত জীবনের প্রতি আপামর মানুষের যে অমেয় আকাঙ্ক্ষা — সেই অন্তর্নিহিত সত্যকেই যেন বা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আছে তেমনি *মেঘদূত*-এর অলকা — যেখানে 'ন চ খলু বয়! যৌবনাদন্যদস্তি' — অপার্থিব আনন্দের সেই দিগন্তব্যাপী যৌবন — যা মানব-ইতিহাসের এক চিরকাঙ্ক্ষিত বসন্ত। আর এই ব্যাপ্তি — এই চেতন-অবচেতনের নির্দ্বন্দ্ব সম্মিলনেই গড়ে উঠেছে সফল এবং সার্বিক এক Magic Realism তত্ত্ব। আবার অপর পক্ষে আছে, সমুদ্রমন্থনের শেষে রাহু-কেতুর ঘটনাসমূহ — না, বিকল্প বাস্তবতার প্রবেশমাত্র ঘটেনি সেখানে। কেবল প্রাচীনকালের প্রাকৃতিক কাহিনির নিষ্ফল এক পৌরাণিক ব্যাখ্যাই এর সারাৎসার হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে *দেবযান*-কথক কিন্তু বলে চলেন সেই ব্যাপ্ত প্রেমের আখ্যানকেই; যার অন্তরে নিহিত হয়ে আছে এক সৎ-দুঃখ। লেখক বলেন, 'দুঃখই জীবনের বড় সম্পদ ... যে জীবন অশ্রুকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, সে জীবন মরুভূমি'। তাই উপন্যাস শেষে যতীনের পুনর্জন্মে তীব্র থেকে তীব্রতর এক বিচ্ছেদ যন্ত্রণার আস্বাদ পায় পুষ্প। আর এই দুঃখের অন্তিমে যে 'দহন' তার অপেক্ষায়, তাতেই যেন সে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠবে; হয়ে উঠবে অপূর্ব থেকে অপূর্বতর। অনুভূত হয়, মৃত্যুর অন্ধকারে নয়; নিবিড় আস্তিক্যচেতনায়; গভীর অস্তিত্ববোধেই পূর্ণ হয়ে আছে এ উপন্যাসের লেখক তথা তাঁর মানসকন্যা পুষ্পও। জীবনেরই খণ্ড-খণ্ড প্রকীর্ণ কিছু স্বপ্ন আর অপার ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা যৌথ হয়ে তৈরি করে চলে সেই বুড়ো শিবতলার ঘাট — যেখানে গাঢ় হয়ে আছে মৃত্যু-পরবর্তী মহত্তর এক পূর্ণতার আস্বাদন। আর এখানেই এই উপন্যাস এক বৃহত্তম জাদুবাস্তবতার সফলতম উদাহরণ হয়ে ওঠে।